এক বহুমুখী প্রতিভার ভিতর-মানুষ অন্বেষণে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজের কাজে নিরন্তর নিমগ্ন থাকেন, তাঁদের কাজের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে বহু দূর, একসময় আবিষ্কার করা যায় তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে ঠিক কোন অভিধায় ভূষিত করলে তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করা যাবে তা নিয়ে আমি দ্বিধান্বিত। তাঁকে প্রথমে আমরা চিনতাম তরুণ কবি হিসেবে, তারপর শিশুসাহিত্যিক হিসেবে, তারপর চিনলাম তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় ভূ-পর্যটক হিসেবে। সারা পৃথিবীর কোনায় কোনায় ঘুরে তিনি সারা বিশ্বকে যেভাবে সিডির মাধ্যমে, টিভির পর্দায় ও কখনও 'ভ্রমণ'-এর পাতায় বাংলা পাঠকের কাছে তুলে ধরছেন তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তাঁর তুল্য পর্যটক এ দেশে আগে হয়নি, পরবর্তীকালে হবে কি না তাও বলা যায় না।

সব শেষে তাঁর আরও যে-পরিচয় আমরা পেলাম তা তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয়। পর পর কয়েকটি ভালো উপন্যাস লিখে ফেললেন গত চার-পাঁচ বছরে।

সব শেষে যে-পরিচয় আরও মুগ্ধ করছে সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালিকে, তা তাঁর ছবি-আঁকার পর্যায়। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি চিত্রকলার নানা মাধ্যমে চমৎকার সব ছবি এঁকে চলেছেন, কয়েকটি প্রদর্শনীও করেছেন, তাঁর এই বিরল প্রতিভায় শিল্পসমালোচকরাও বিস্মিত।

সব মিলিয়ে তিনি যেন এক চলমান সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রাণ মানুষ। এরকম একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মূল্যয়ন করা খুবই দুরূহ। আমি বরং তাঁর ছোটদের লেখাগুলির কয়েকটি নিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করি। 'কবিতা-পরিচয়' নিয়েও কিছু কথা।

সাহিত্যের অনেকগুলি ধারা আছে, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণকাহিনি, ছোটদের লেখা— এরকম আরও। আমি কোনও না কোনও সময় সবগুলিতেই মাঝেমধ্যে চেষ্টা করেছি বলে উপলব্ধি করেছি সবচেয়ে কঠিন হল ছোটদের জন্য লেখা। শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে বড় হয়ে ওঠার পর ছোটবেলার জগৎটা হয়ে ওঠে ক্রমশ ফিকে, সেই ধুলো-পড়ে ধূসর হয়ে ওঠা পৃথিবীর মধ্যে ধুলো সরিয়ে ঢুকে পড়ে ছোটদের জন্য লেখা সত্যিই কঠিন। শুধু লিখলেই তো হবে

না, ছোটদের মনের মতো হওয়া চাই।

'শাদা ঘোড়া' সম্ভবত তাঁর প্রথম বই, যা প্রকাশমাত্র প্রভূত সাড়া জাগিয়েছিল পাঠকের কাছে। ছোটদের কাছে তো বটেই, বড়রাও সমান আগ্রহে পড়েছে রূপকথার আদলে লেখা বইটা। বিজু, যার নাম বিজয়, তার জবানিতে লেখা এই শাদা ঘোড়ার গল্প। বিজু এক রাখাল বালক, মাতলা নদীর ওপারে গিয়ে পেয়েছিল ঘোড়াটা, যাকে নিয়ে এসেছে তার আস্তানায়, নাম দিয়েছে শাদাপাল। সারাদিন তার দেখভাল করে, তার জন্য নানা উপায়ে খাবার সংগ্রহ করে, তাকে খাওয়ায়, আস্তে আস্তে বড় করে তোলে। কিন্তু তার বরাত মন্দ, শাদাপালের উপর নজর পড়ে এলাকার রাজার একরত্তি মেয়ে টুকটুকের, টুকটুক তার পিঠে চড়ে বেড়াতে যাবে বলে বায়না ধরে। আদুরে মেয়ের আব্দার মেনে নিয়ে রাজা অমনি হুকুম করলেন বিজয়কে, শাদাপাল তাঁর চাইই। এখনই নিয়ে এসো রাজার কাছে।

শাদাপালকে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না বলে তাকে নিয়ে পালাল বিজয়, কিন্তু রাজার নজর এড়িয়ে পালাবে কোথায়! শাদাপালকে বেঁধে নিয়ে গেল রাজার পেয়াদা। এক ফাঁকে বুদ্ধি করে আবার পালাল শাদাপাল। বিজুর প্রতিজ্ঞা এ অপমানের প্রতিশোধ সে নেবে। রাজাকে সে মাটিতে শোয়াবেই।

তারপর বিজয় আর শাদাপালের এক রোমহর্ষক অভিযান। কী করে রাজাকে জব্দ করবে, তার প্রতিজ্ঞা রাখবে, সেই কাহিনি টানটান করে রাখবে পাঠককে।

কাহিনি যেমন দারুণ উত্তেজনার, তার ভাষা পড়ে বুঁদ হয়ে থাকার মতো, 'ভোর হবার অনেক আগে, নিশুতি রাতে, গ্রামের পাখিরাও যখন ঘুমোচ্ছে, আকাশের তারা ছাড়া আর কেউ জেগে নেই, সেই সময় শাদাপালকে নিয়ে আমি গ্রাম ছাড়লাম। সারারাত হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে একটা শান-বাঁধানো পুকুর দেখে যখন শাদাপালকে জল খাওয়ানোর জন্য দাঁড়িয়েছি, তখন আকাশে ভোরের রং ধরেছে, জলে আলোর কুঁড়ি ফুটেছে, দুটো-একটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।' কিংবা একেবারে শেষের দিকে, 'আর গ্রামের জোয়ানরা যুদ্ধে যাবার তোড়জোড় করতে লাগল। সেখানে কিছুদিন নদীর মাছ, সুগন্ধি চালের ভাত, কালো গাইয়ের দুধ আর মিষ্টি ডাবের জল খেয়ে, আর সকলে মিলে তীর-ধুনক মহড়া দিয়ে একদিন আমরা দল-বেঁধে আমার দেশের দিকে রওনা দিলাম।'

'শাদা ঘোড়া'র বিশেষত্ব হল এই গল্প কোনও প্রচলিত রূপকথার অনুসারী নয়, লেখকের সম্পূর্ণ স্বপ্রসূত গল্প, ছোটদের কল্পনাকে উসকে দিতে এরকম নরম ভাষায়, এমন সুন্দর চিত্রকল্প আর টানটান গল্পের কোনও জুড়ি নেই।

আর একটি বই 'বরফের বাগান' খুবই বিখ্যাত, বহুবার বহুভাবে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু আজও এই বই ছোটদের সঙ্গে বড়দেরও বুঁদ করে রাখবে কয়েক ঘণ্টার মতো। বইটি আমি আগেও পড়েছি, আজ আবার পড়লাম কাহিনিটির ভালো লাগার জায়গাটা খুঁজে বার করতে। সুমেরু-কুমেরু নিয়ে মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। পৃথিবীর দুই শেষপ্রান্তে পৌঁছতে মানুষ বহুবার ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়েছে, কেউ সফল হয়েছে, কেউ নিষ্ফল। এখন চলাচলের সুব্যবস্থার ফলে যাওয়া-আসার

সুবিধা যথেষ্ট। তবু একেবারেই কি ঝুঁকি নেই! 'বরফের বাগান' পড়তে গিয়ে শিরশির করে ওঠে গাত্রত্বক। আন্টার্কটিকা সম্পর্কে সেই শৈশবে পাঠ্যপুস্তকে পড়ার অভিজ্ঞতা ছিল একেবারেই স্বকল্পিত। তা ছিল অক্ষরের জগৎকে নিজের কল্পনার সঙ্গে মিশেল দিয়ে নিজের মতো করে এক অচেনা পৃথিবী নির্মাণ, কিন্তু 'বরফের বাগান' পড়ে এতদিনকার কাল্পনিক পৃথিবী চোখের সামনে জেগে উঠল হিচককের সিনেমার মতো। বরফের দেশে এমন অতিমানবিক অভিযান এক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় কে করতে সাহসী হবেন!

চমৎকার সব বর্ণনার ফলে পৃথিবীর শেষপ্রান্তের পটভূমি এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, মনে হবে পাঠক নিজেও হাঁটছেন সেই মাইল মাইল বরফের উপর দিয়ে। লেখকের বর্ণনা উদ্ধৃত করি, যেমন, একটা বিশাল হিমবাহের সামনে এসে লিখলেন: 'আন্টার্কটিকায় একেকটা হিমবাহ দু-চারশো কিলোমিটার দীর্ঘ হয় বলে শুনেছি, সামনের ওই বরফপ্রাচীরও তেমনই খুবই দীর্ঘ। যতটা দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের একেবারে বাঁদিকের অংশে মস্ত একটা তোরণ বা খিলান। তেমনই সুন্দর এর স্থাপত্য। মনে হয় খুব বড় কোনও স্থপতি এসে জমাট বরফ কেটে তৈরি করে দিয়ে গেছেন। তোরণের কাছে এসে দেখছি এখানেও ফাটলের মতো নীল আলো।'

যাঁরা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর এই বর্ণনা-অংশের সিডি দেখেছেন তাঁরাই জানেন কী অপূর্ব এই নীল আলোর শোভা। ছোটদের এবং বড়দেরও এই উপন্যাসটিতে বরফের দেশের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছে এক আশ্চর্য রূপকথা। জাহাজে আলাপিত হওয়া এক রহস্যময় লোক যিনি লেখককে নিয়ে যাবেন এক রূপকথার দেশে, তারপর আন্টার্কটিকার মতো রহস্যময় পরিবেশ যে ক্রমশ আরও রহস্যে ভরপুর হয়ে যাবে তা বইটি শেষপর্যন্ত না পড়লে অনুমানই করা যাবে না।

আর একটি বই 'চোখে দেখা গল্প' একই সঙ্গে ছোটদের, আবার বড়দের পড়ার মতো। বইটা একটু অন্যরকম, আর পাঁচটা গল্প-উপন্যাসের মতো নয়। একরাশ টুকরো টুকরো কাহিনি যার প্রত্যেকটিই লেখকের ভ্রমণ-সংক্রান্ত নানা অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ। সূচিপত্র থেকেই অনুমান করা যাবে বইটির মধ্যে লুকিয়ে আছে কী আশ্চর্য সব মণিমুক্তো। 'বন্ধু বানরদল' থেকে শুরু, তারপর ক্রমান্বয়ে 'নীলনদের ফেরিওয়ালা', 'মোঙ্গোলিয়ার যাযাবরদের তাঁবুতে', 'সিরিয়ার বেদুইনদের তাঁবুতে', 'আফ্রিকার সেৎসি মাছি', 'বুলগেরিয়ার গোলাপ', তাছাড়াও আছে এদেশি অভিজ্ঞতার চমৎকার সব টুকরো, যেমন, 'জিরেন কাটের রস', 'পাখিও আমাদের স্বজন', 'জুনপুটের সন্তোষমাঝি' —এমন অনেক। আসলে ভ্রমণ অনেকেই করেন, কিন্তু সেই ঠাঁইনাড়া মুহূর্তগুলোর মধ্যে হিরেমুক্তোগুলো খুঁজে বার করে শিশু-কিশোরদের সামনে মেলে ধরতে ক'জনই বা আর পারেন!

পরের দু'টি বই সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস কাহিনি, দু'টিই গভীর জঙ্গলের পটভূমিতে।

প্রথমটি 'আমাজনের জঙ্গলে' দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত জঙ্গল আমাজন নদীর তীরে আমাজন জঙ্গলের পটভূমিকায় এক দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। গল্পের কথক এক কিশোর, তার কাকা বারীণ থাকেন রিও ডি জেনিরোতে। গল্পের

কথক— সেই কিশোর একটা চিঠি লেখার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সারা পৃথিবী ঘোরার একটা প্লেনের টিকিট পেয়ে গেছে। কিন্তু শুধু টিকিট দিয়ে তো আর বিশ্বে পর্যটন করা যায় না। তার থাকা-খাওয়ার জায়গা সব দেশে নেই। থাকা-খাওয়ার খরচ কি কম! তাই দক্ষিণ আমেরিকায় বারীণকাকার ডেরায় যাওয়াই সাব্যস্ত করেছে। বারীণকাকা সেখানে রঙিন পাথরের ব্যবসা করে বিশাল প্রাসাদ বানিয়ে বাস করেন। তখনও কিশোরটি জানত না সেখান থেকে তাকে যেতে হবে প্রথমে ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাজিলিয়ায়, সেখান থেকে প্লেনে করে মানাউসে। মানাউস জেটি থেকে মোটরবোটে আমাজন নদী বরাবর তাদের যাত্রা আমাজন জঙ্গলে।

ঠিক এখান থেকে শুরু সমস্যার। একটি উলিমাঙ্কি অর্থাৎ যেন বা পুরু কম্বলগায়ের বানর লাফ দিয়ে এসে মোটরবোটে বারীণকাকার কাছ থেকে তার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে সোজা জঙ্গলের মধ্যে। বারীণকাকা চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার সর্বস্ব চলে গেল।' সঙ্গে সঙ্গে বারীণকাকা আর তাঁর ওদেশীয় সঙ্গী গঞ্জ্যালো বোট থেকে নেমে দৌঁড়লেন জঙ্গলের মধ্যে ব্যাগের খোঁজে, কিশোরকে বোটম্যানের কাছে একা ফেলে। ব্যস, তাঁদের আর দেখা নেই, বোটম্যানও অপেক্ষা করে-করে কিশোরকে ফেলে চলে গেল বোট নিয়ে।

এর পর ঘন জঙ্গলের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে যে সাংঘাতিক ঘটনাগুলো ঘটতে লাগল একের পর এক, তাই নিয়ে এই উপাখ্যান। এরকম একটি রুদ্ধশ্বাস কাহিনি পড়তে পড়তে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

জঙ্গলের পটভূমিকায় আর একটি বই 'গরিলার চোখ', সূর্যের আলোও প্রবেশ করতে পারে না এমন রুদ্ধশ্বাস এক কাহিনি। 'বরফের বাগান'-এ বরফের দেশে ছিল প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ, 'আমাজনের জঙ্গলে' বইতে জঙ্গলের মধ্যে এক বন্য মানুষদের ডেরায় রোমহর্ষক কাহিনি, আর 'গরিলার চোখ'-এ আর এক নতুন অ্যাডভেঞ্চার। গভীর জঙ্গলের মধ্যে গরিলার মতো হিংস্র প্রাণীর এক অন্য চেহারা। প্রথমে কাতারে পৌঁছনো, তারপর সেখানকার রাজধানী দোহা থেকে আবার একটা ফ্লাইট ধরে কিগালি। সেখান থেকে ঘন জঙ্গলের ভিতর ট্রেক করে মাইল মাইল পথ হেঁটে গরিলার ডেরায় গিয়ে গরিলার মুখোমুখি হওয়ার রোমাঞ্চ, ভয় আর শিহরণ এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। পড়ার সময় ভাবতেই পারছিলাম না গহন অরণ্যের মধ্যে লেখক ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী মিলে একেবারেই খালি হাতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছেন সামনেই একদঙ্গল গরিলার কার্যকলাপ। সেই সঙ্গে বুনো মহিষবাহিনীর সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড মোকাবিলা আর এক রুদ্ধশ্বাস অধ্যায়।

প্রতিটি বইই ছোটদের কাছে এক পরম প্রাপ্তি। ছোটদের পৃথিবীর জয় করার সঙ্গে এভারেস্ট জয় করার কোনও পার্থক্য নেই। বরং ছোটদের পৃথিবীতে পৌঁছতে গেলে ছোটদের মনস্তত্ত্ব জানা চাই। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর এতগুলি ছোটদের বই রুদ্ধশ্বাসে পড়ার পর মনে হল তিনি জানেন শিশু-কিশোরদের মন জয় করার বিরল কৌশল। পাঠক অনুভব করবেন লেখক খুব সহজেই তাঁর লেখনী নিয়ে পৌঁছে যেতে পারেন ছোটদের মনের কাছে, তাঁকে সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃপক্ষ

২০১৬ সালে শিশু-সাহিত্য পুরস্কার দিয়েছেন যথাযর্থ বিবেচনায়।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'কবিতা-পরিচয়' বইটি নিয়ে অনেকদিন ধরে কিছু লিখব-লিখব ভাবছিলাম, এই সুযোগে লিখে ফেলি। বাংলা সাহিত্যে কবিতা নিয়ে আলোচনা আগেও হয়েছে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে। বেশির ভাগ পত্রিকায় গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদির শেষে গ্রন্থ-সমালোচনা থাকে, কিন্তু এক-একটি কবিতা ধরে তার সামগ্রিক আলোচনা বোধহয় আগে হয়নি। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ঠিক এই জায়গাটা আবিষ্কার করে তাঁর পত্রিকায় বাংলা কবিদের কিছু শ্রেষ্ঠ কবিতা নিয়ে অন্য কবিদের দিয়ে আলোচনা করিয়েছেন এক বছরেরও বেশি সময়কালে। সেই লেখাগুলি একত্র করে তাঁর সম্পাদনায় 'কবিতা-পরিচয়' বইটি বাংলা সাহিত্যের এক সম্পদ। বিশেষ করে তরুণ কবিদের এই বইটি পড়া অত্যন্ত জরুরি। একটি কবিতা দু'জন বা অনেকে মিলে কীভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন, অনেক সময় একে অপরের ঠিক বিপরীত কথা বলছেন, কেন বলছেন, তা পড়লে স্পষ্ট হবে বাংলা কবিতার অন্দরমহল।

একটি বিখ্যাত কবিতা কীভাবে আলোচিত হয়েছে নানাভাবে তা বিস্মিত করবে পাঠককে।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা 'সুন্দর' নিয়ে আলোচনা করেছেন তিন কবি— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনজনের আলোচনা তিনমুখী। কেউ কারও সঙ্গে একমত নন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যা বিশ্লেষণ করেছেন, তা পড়ে আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছেন, 'সুনীল-রচিত ভাষ্য অত্যন্ত সপ্রতিভ ও অগভীর'। মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'সুনীলবাবু পাঠ করেছেন এক ভ্রামণিকের কতকগুলি ক্ষণসাম্প্রতিক খেয়ালি ক্ষণের শব্দরূপ হিসেবে। কিন্তু এ-কবিতা আমাকে টানে গভীরতর তাৎপর্যের দিকে'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার উত্তরে বলেছেন, 'এখন সমালোচকদেরও চশমা বদল করতে হবে।'

আলোচনাগুলো পড়ে বেশ উপভোগ করেছি। একই কবিতা এক-একজনের কাছে এক-একরকমভাবে ধরা দিয়েছে, একে অপরের লেখা নস্যাৎ করে দিয়ে নিজের মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। পরস্পর বিপরীতমুখী সমালোচনা পড়ে স্বয়ং শঙ্খ ঘোষ কী ভেবেছেন তা অবশ্য জানা যায়নি।

আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা আলোচনা করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার ও অমিতাভ দাশগুপ্ত। সেখানে অশ্রুকুমার সিকদার যে-আলোচনা করেছেন তা অনেক জায়গায় পছন্দ হয়নি অমিতাভ দাশগুপ্তর। এ এক আশ্চর্য দ্বন্দ্ব।

কবিতার এই দ্বন্দ্ব এই বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছিল সংশ্লিষ্ট কবিরা তাঁদের সৃষ্টির এই কাটাছেঁড়া পড়ে কী ভেবেছিলেন! ক্রুদ্ধ, না কি মুচকি হেসেছিলেন আলোচনাগুলো পড়ে। সমালোচক যা লিখেছেন হয়তো আদৌ তিনি তা ভাবেননি। তাঁর ভাবনাটা আদতে কী তা জানতে পারলে আরও জমে যেত এই দ্বন্দ্বের জায়গাটা।

তবে সবচেয়ে যা আশ্চর্যের, যে-আলোচনাগুলি ছাপা হয়েছিল উনিশশো ছেষট্টি থেকে আটষট্টি পর্যন্ত, আজ পঞ্চান্ন বছর পরে, সেই কবিরা এক-একজন কিংবদন্তী। (অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে এর মধ্যে ধরছি না)। তিরিশের কবিরাও তখন প্রতিষ্ঠিত। বাকিরাও এখন বাংলা কবিতার এক-একজন মাইলস্টোন।

সংস্করণটির ইতিহাসমূল্য তাই অপরিসীম।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী মানুষটি ঠিক কীরকম তা বুঝে ওঠা সত্যিই এক দুরূহ বিষয়। কোনটি তাঁর প্রকৃত বিচরণের ক্ষেত্র তা আমি এখনও বুঝিনি। যে-বিষয়েই হাত দিয়েছেন, সোনা ফলিয়েছেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নিজে কি জানেন কোন বিষয়ে তিনি অধিকতর স্বচ্ছন্দ?